আগমনী

জননী, তোমার প্রতীক্ষায়

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

মা, তোমার সেই ঘোর বেদান্তী, ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র তোতাপুরীর কথা মনে আছে? 'বেদান্তোক্ত কর্মফলদাতা ঈশ্বর' ছাড়া আর কারও কাছে যাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্ত মাথাটা নত হত না! তোমাকে মানা তাঁর চোখে ছিল অজ্ঞতা আর কুসংস্কার! তাই যখন দেখতেন তাঁর সাধকশিষ্যটি তোমার কথায় নির্বিচারে ওঠেন বসেন, তখন সেই শিষ্যের প্রতি তাঁর মুখে কেমন করুণা আর ঠোঁটে ব্যঙ্গমেশানো হাসি ফুটে উঠত! অথচ শিষ্যের উপাস্য মা-টিই যে তাঁর উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্ম; পার্থক্য শুধু রূপ আর অরূপে, তা সেই শিষ্য গুরুকে যতই ঠারে-ঠোরে বোঝাতে চেষ্টা করুন, তিনি বুঝলে তো! তোমাকে মানতেন না বলে কোনওরকম ভক্তি উপাসনার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করতেন না। সেই তিনি একবার রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেবেন ঠিক করেছিলেন। রাতের অন্ধকারে মাঝগঙ্গায় গিয়েও ডুবজল না পেয়ে নিজের অজান্তেই যখন তিনি বলে ফেলেছিলেন "ইয়ে কেয়া দৈবী মায়া!"—তখন তাঁকে হুঁশ ফিরিয়ে তাঁর দৃষ্টি থেকে অসম্পূর্ণতা দূর করালে তুমি। আর অমনি তিনি দেখলেন, তুমি জলে-স্থলে, তুমিই শরীর-মন, যন্ত্রণা-সুস্থতা, জ্ঞান-অজ্ঞান, জীবন-মৃত্যু... আবার শরীর মন-বুদ্ধির পারেও সেই তুমিই—তুরীয়া, নির্গুণা। বোধে বোধ করলেন তুমিই সেই—যাঁকে তিনি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করে এসেছেন এতকাল!—মনে পড়ছে মা? সেই তোমাকে মার্কণ্ডেয়পুরাণ কত ছোট্ট বাক্যে বর্ণনা করেছেন "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা" —তুমি জগতের একমাত্র আধার বলে। তুমি সর্বভূতে শক্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে সংস্থিতা, আবার সমস্ত বিদ্যা তোমারই বৈভববৈচিত্র্য।

আচ্ছা মা, একটা প্রশ্ন মনে জাগে। এত বড় মহাত্মা তোতাপুরীজী কি মার্কণ্ডেয়পুরাণ পড়েননি? যেখানে তোমার হাতে ছোটভাই নিশুম্ভের মৃত্যু দেখে দৈত্যরাজ শুম্ভ চিৎকার করে তোমাকে দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিল,

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥"

—হে বলগর্বে উদ্ধত দুর্গা, তুমি গর্ব কোরো না। অতি গর্বিতা হয়েও তুমি অন্যদের শক্তি ধার করেই তো যুদ্ধ করছ।—এমন কথা শোনামাত্র তুমি দৈত্যরাজকে জানিয়ে দিলে, একা তুমিই জগতে বিরাজ করছ। তুমি ছাড়া জগতে আর কেউ কোথাও নেই, সব তোমারই বিভূতি, তোমারই শক্তি। শুধু

যে মুখেই বললে তা নয়, তোমার স্বরূপ তাকে দেখিয়েও দিলে—''পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥'' এই দুষ্ট, দেখ এরা আমারই শক্তি, আমাতেই প্রবেশ করছে। মুখে তুমি দৈত্যরাজকে যতই দুষ্ট সম্বোধন কর না কেন, চিত্তে তাঁর প্রতি তোমার কৃপার ফল্গুধারা বইছে। তাই তো অত সহজে নিজের স্বরূপটি দেখিয়ে দিলে! আর আমরা সেই কবে থেকে তৃষিত নয়নে চেয়ে আছি—সেখানে সব ভোঁ ভাঁ! জননীর উপযুক্ত ব্যবস্থাই বটে! বলার তো কিছু নেই। যার পেটে যা সয়! বুঝতে পেরেছি, আমরা এখনও মুখে চুষি নিয়ে খেলায় মত্ত। এখনও চুষি ফেলে হাত-পা ছুঁড়ে মা-মা বলে কাঁদতে শিখিনি। তাই তুমিও ভাতের হাঁড়ি ফেলে দৌড়ে আসার তাগিদ অনুভব কর না।

তোমার কাছে আমরা কী না চাই বলো? রূপ-জয়-যশ-সৌভাগ্য-আরোগ্য-পরমসুখ—আরও কত কী! কত অকপটে চেয়ে বসি—''ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।'' জানই তো ভেতরে বিকার! কিন্তু তাই বলে তুমি ভেবো না, আমরা চিরকাল ধরে এই বিকারের ঘোরেই থাকব। সংসারের আঁচে ঝলসাতে ঝলসাতে ভাজা-পোড়া হয়ে যে-মুহূর্তে আমাদের মন থেকে আসক্তি দূর হবে, আর কিচ্ছুটি না চেয়ে শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্য, নিদেনপক্ষে শুধু একটিবার তোমাকে দেখার বাসনায় মনটা কেবল মা যাই-মা যাই করবে, তখনই চাইব জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। তুমি এই ক্ষণটির জন্যই যে অপেক্ষা করে থাক তা জানি। তাই তখনই প্রসন্ন মনে তোমার মহিমা প্রকাশ কর। আর আমরাও তোমার মাহাত্ম্য জনে জনে শোনাতে থাকি—''সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে''—এই দেবীই প্রসন্না হলে মানুষকে মুক্তি দান করেন।

এত কথা যে লিখছি তার একটা কারণ আছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শরৎঋতু। কী করে বুঝলুম বলো তো? বসন্তে মনটা কেমন যেন দূর দিগন্তে বেরিয়ে পড়তে চায়। তখন যেদিকে তাকাই দেখি এদিকে কৃষ্ণচূড়া ওদিকে রাধাচূড়া আরও কত ফুলের সারি! সকলেই যেন হাতছানি দেয় কোথাও হারিয়ে যেতে। আর শরৎকাল ঠিক উলটো। মনটাকে গুটিয়ে নিয়ে আসে সেইখানে, যেখানে তোমার স্নেহের মতো নিঃশব্দে রাতভোর শিশিরবিন্দু জমতে শুরু করে ঘাসের ডগায়। আর তার ওপর টুপটাপ শিউলি ঝরে পড়তে থাকে। একটু দূরে কাশের বন হেলেদুলে হাসতে হাসতে তার প্রাণের আনন্দটাকে ছড়িয়ে দিতে চায় এপারে-ওপারে। কী যে নির্মল হাসিটি তার! কোথাও কারও সঙ্গে কোনও বৈরিতা নেই তার মনে। জলের পদ্ম রূপে-সৌরভে তার শোভা দেখায়, স্থলপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে তার নরম পাপড়ি নেড়ে জানিয়ে দেয় সে কীসে কম!

এইসব দেখেই বুঝতে পারি, শিউলিতলার পাশে যেখানে রাশিকৃত ঝরাফুল, তার ওপর দেবতাদের রত্নরঞ্জিত মুকুট ঠেকানো, আলতা পরা টুকটুকে তোমার শ্রীচরণদুটি ধীরে ধীরে ফেলে আমাদের ডাকে নিশ্চিত তুমি আসছ। আর একটা জিনিস দেখেও তোমার আগমনবার্তা সুনিশ্চিত করে জেনেছি। সেটা কী বলো তো? ওই যে নীল আকাশে মাঝে মাঝে জলভরা মেঘগুলো তাদের গাম্ভীর্য বজায় রেখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তা থেকেও বুঝতে পারছি তোমার মনটা আমাদের আর্তিতে যতই উচাটন হয়ে উঠছে, কৈলাসপতির মুখের ভাবও ততই গম্ভীর হয়ে উঠছে। দেবাদিদেব তোমাকে ছাড়তে চাওয়ার অনিচ্ছার মাধুর্যটুকু যেন ওই গম্ভীর জলদপুঞ্জের মধ্যে প্রকাশ করছেন। এটা তো ঠিক, নয় নয় করে তাও তো চার পাঁচ দিন তাঁকে এই বিরহ সহ্য করতে হবে! আবার মুদিতনয়ন মহেশ্বর আপন আসনে বসে মনে মনে প্রমাদও গোনেন। কারণ তিনি কানাঘুষোয় শুনতে পেয়েছেন যে, শাশুড়িমাতা সংকল্প আঁটছেন এবার

তাঁর কন্যাটি এলে তাঁকে নাকি আর পতিগৃহে পাঠাবেন না। কারণ তিনি শুনেছেন, সকাল হলেই মহেশ্বর অ্যাত্ত বড় একটা ফরমায়েসি ফর্দ ধরান তাঁর প্রাণের পুতলী উমার হাতে। নিম, সিম, বেগুন দিয়ে তেতো রাঁধতে হবে। তাতে গোটা দশ কাঁঠালবিচি বাটা, ফুলবড়ি আর বেশ খানিকটা আদা বেটে তার রসটুকু দিতে হবে। তার পরে শুক্তো, সর্ষেশাক, মুসুরডাল, ঘিয়ে জিরে ফোড়ন দিয়ে পালংশাক। এরকম কত পদ! অথচ মেয়েকে আড়ালে চোখের জল ফেলতে হয়। কারণ কৈলাসে কন্যার হেঁসেলে নাকি বেশির ভাগ দিনই অন্ন বাড়ন্ত! কত কষ্টে অথচ মুখের হাসিটি অক্ষুণ্ণ রেখে যে শিবানীকে সংসার করতে হয় তা দেবা ন জানন্তি। কথায় বলে, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—গৃহিণীই তো গৃহ। সেই গৃহিণী পিতৃগৃহে আসবেন। আসার দরকার আছে মানছি। কিন্তু সে-কদিন হিমভবনের কর্তার অন্নের ব্যবস্থা কী হবে কজন তা ভাবে!

আমাদের অতশত ভাবার তো দরকার নেই। আমরা শুধু বুঝি কথার মূল্য। বলেছিলে, ''...যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।''—যখনই দানবদের প্রাদুর্ভাবে বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি আবির্ভূতা হয়ে দেবশত্রু অসুরদেরকে বিনাশ করব। মা, অসুর আর কোথায় আছে বলো আলাদা করে? সকলেই তো উপযুক্ত বাসস্থান জ্ঞান করে এই মনে আশ্রয় নিয়েছে। শতাধিক কামনা-বাসনার জাল তারা বিস্তার করেছে। ঈর্ষার হলাহল তাদের চোখে মুখে। ইদানীং আবার সারা বিশ্ব জুড়ে অশুভ ভাইরাসের কালো ধোঁয়া, মৃত্যু তার শ্বাসে-প্রশ্বাসে। ''দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ''—তোমাকে দুঃসময়ে স্মরণ করলে তুমি সকলের ভয়নাশ কর। তাই তোমায় এমন কাতরভাবে ডাকছি। তাছাড়াও তোমাকে ডাকার আরও কারণ আছে।

দেখো, জলভর্তি ঘটে তোমার পুজো হয় ঠিকই, কিন্তু মন্ত্র বলে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় আমাদের ভাবতে হয় এই ঘটের ভেতর কোথাও তুমি নিশ্চয়ই আছ। আর সামনে তোমার প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে সাধক যখন দেখেন তুমি শ্বাস নিচ্ছ, তখন তোমার সেই রূপ চোখের সামনে দেখে রাঙা চরণে অঞ্জলি দেওয়া—এ-দুইয়ে যে বিস্তর তফাত তা তুমি নিজেও জান। তোমাকে চাক্ষুষ দেখব বলেই তো এত করে ডাকা।

জননী, শাস্ত্র শতমুখে তোমার রূপের প্রশংসা করে বলেছেন তোমার মুখটি 'পূর্ণেন্দুসদৃশ'। শাস্ত্র বলেছেন, তাই নতশিরে তা আমরা মেনেও নিই। কিন্তু চোখ তো মানতে চায় না। কেনই বা মানবে বলো? পূর্ণিমার চাঁদ সুন্দর, দ্বিমত নেই কারও। কিন্তু সেখানে কালো কালো কত দাগ চোখে পড়ে যে! কিন্তু তোমার মুখে তো সেরকম কোনও দাগ দেখি না। আর দেখবই বা কী করে? তুমি নিজেও জান তোমার মধ্যে কোথাও কোনও মালিন্য নেই। তবু শুধু আমাদের শেখাবার জন্যই তোমাকে প্রার্থনা করতে হয়—চাঁদে যে কলঙ্ক আছে, তোমার মধ্যে যেন সেটুকুও না থাকে। এত জেনে শুনেও যদি কোনও পাষণ্ড তোমার মধ্যে হিংস্রতা খুঁজে পায় আর বলে ওঠে, ওই তো তোমাদের জননী দেবী দুর্গা কী নিষ্ঠুরভাবে সন্তানের বুকে ত্রিশূল গেঁথে ক্ষত বিক্ষত করছে, তার জন্য কোথাও এতটুকু কি দুঃখ বা অনুতাপ আছে তার? বরং দেখছি মুখে হাসি। এর উত্তর অবশ্য শাস্ত্রই দিয়ে রেখেছেন—তোমার চিত্তে কৃপা সমরে নিষ্ঠুরতা! শুনে তিনি বলবেন, সমরে নিষ্ঠুরতা তো নিজের চোখেই দেখছি। কিন্তু চিত্তে কৃপা! এ আবার কেমন কথা! তিনি তো আর জানেন না যে বধের আগে তুমি নিজেই অসুরকে পরামর্শ দিয়ে রেখেছ—বধের মুহূর্তে যত কষ্টই হোক না কেন, ''নৈব ত্যক্ষ্যসি মৎপাদম্''—আমার পা কিছুতেই ছাড়বে না। তাই তো তোমার বামপায়ের বুড়ো আঙুলটা মহিষাসুরের

কাঁধে—''বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।'' যে-শক্তিশালী অসুর স্বর্গ থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে ইন্দ্র হয়ে বসেছিলেন, সেই অসুরের চুলের মুঠিটা ধরে এমনভাবে তোমার মুখের দিকে তাঁর মুখটাকে বাঁকিয়ে ধরে আছ যে, তাঁর মুখের সব ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে মনটাও তোমাতে লীন হয়ে স্থির! তদ্‌গতচিত্ত অসুরদাদার তাই হুঁশই নেই একটা পা সিংহমামা কামড়ে কখন এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে, একটা কান তারই কামড়ে রক্তারক্তি। তোমার পরামর্শের কথা মনে রেখে, এহেন দৈহিক যন্ত্রণা ভুলে তোমার হাসিমাখা মুখকমলের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে খোলা চোখে সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করছেন!

সন্তান বিদ্বেষবশত অনুক্ষণ তোমারই যে চিন্তা করেছে এতক্ষণ! তার পুরস্কার! বুড়ি ছুঁয়ে ফেলা সন্তানের আনন্দ তাই তোমারও চোখে-মুখে। তাই তোমার হাসিমাখা মুখ! ভক্তিভাবে তোমাকে আমরা প্রাপ্ত হই ঠিকই, কারণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিয়েছ—''ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি''—ভক্তির বলে ভক্ত আমায় জানতে পারে। আর ''বিশতে তদনন্তরম্''—জেনে আমাতে প্রবেশ করে। আসলে ভক্তিভাজনদের আমরা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে অনেকটা সময় নিশ্চিন্ত হই এই ভেবে যে তিনি প্রসন্নমনে আমার প্রণাম গ্রহণ করেছেন। তখন আমরা অন্য কাজে হাত দিই। কিন্তু অসুররাজের তো তোমার চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা বা কাজ কিছুরই অবকাশ হয়নি। তাই এত শীঘ্র এত বেশি পরিমাণে কৃপা তোমার! সেইজন্যই কোন যুগ থেকে আমাদের মন্ত্রপূত চন্দনমাখানো বেলপাতা আর ফুলের রাশির অঞ্জলি তোমার পায়ে যেমন পড়ে তেমনই একইসঙ্গে তা গড়িয়ে পড়ে ওই বুদ্ধিমান ও মুক্ত অসুরটিরও পায়ে। ধন্য জননী! ধন্য সন্তানের প্রতি তোমার কৃপার কৌশল!

হাতের কলমও হাঁ করে তোমার প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে! আশ্চর্য হয়ে সে কী ভাবছে জান? ভাবছে, যে-হাতে তুমি ছেলের বুকে ত্রিশূল বসাও, সেই হাতেই মাঝরাতে পরম যত্নে তার পায়ের তলার কাঁকর সরাও; সেই হাতেই তার বিছানার চাদর কেচে ধবধবে করে রাখো; সেই হাতেই ইচ্ছেমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানও দিয়ে দাও তাকে! তুমিই তাকে মোহপাশে বদ্ধ কর, আবার সেই মোহ-কালিমা পরিষ্কার করে তাকে কোলে তুলে নেওয়ার দায়িত্বও অনুভব কর! লিখতে লিখতে কলমটাও ঘাড় উঁচু করে বলে উঠছে ''ইয়ে কেয়া দৈবী মায়া!''

ওই দেখো, রোদ্দুরের আলতো ছোঁয়ায় কেমন পদ্মের পাপড়ি খুলছে! কাঁটার আড়াল থেকে কেয়া কেমন গন্ধ ছড়াচ্ছে। গ্রাম্যবধূ ঘরের শত কাজ একলা হাতে সেরে একটু সময় করে তোমায় কেমন চিঠি লিখতে বসেছে—তার শালুকফোটা গ্রামের মাটির ঘর নিকিয়ে, উঠোনে আলপনা এঁকে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

মা, মনটা বারবার চলে যাচ্ছে কুমোরটুলিতে, যেখানে তোমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে শিল্পী পরম যত্নে পাদপীঠে আলপনা আঁকছে, তোমার টানা চোখদুটোয় শিরা-উপশিরাগুলোয় পর্যন্ত কী নিখুঁত তুলির টান দিচ্ছে—সেখানে। অসুরদাদার চুলের যেমন বাহার, সিংহমামার কেশরেরও তেমনি। ভাবতে ভাবতেই মনটা আনমনা হয়ে যাচ্ছে।

কানে মন্ত্র বাজছে—আয়াহি বরদে দেবি—ধূপের গন্ধ, দীপের আলো, থরে থরে নৈবেদ্যের আয়োজন এসবই তোমার দিকে মনটাকে ফেরাবার জন্য মা। আসলে ''তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন,/নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥''

এর কোনওটাই তুমি বৃথা হতে দেবে না জানি। পথ চেয়ে বসে আছি রাঙা চরণে রং-বেরঙের ফুল দেব বলে। মা, ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় তোমার বোধন হবে। তুমি এসো।